অ্যাকশনধর্মী
ওয়েস্টার্ন উপন্যাস

প্রহরী

শওকত হোসেন

বেঙ্গলবুকস

প্র কা শ ক
মাহমুদুল হাসান
বেঙ্গলবুকস
নোভা টাওয়ার, ২/১ নয়া পল্টন, ঢাকা ১০০০
বিশাল বুক কমপ্লেক্স, ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : +88 01958519882, +88 01958519883
পরিবেশক : কিন্ডারবুকস, বেঙ্গলবুকস

বইটির কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ বই কম্পোজ বা ফটোকপি আকারে বিক্রয় বা সরবরাহ অবৈধ। এ বইয়ের কোনো লেখা বা চিত্র হুবহু, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করে ছাপানো এমনকি কোনো ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা কপিরাইট আইন, ২০২৩ অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

ISBN : 978-984-99293-3-8

www.bengalbooks.com.bd
email : info@bengalbooks.com.bd

বে ওয়েস্টার্ন
একটি বেঙ্গলবুকস
সিরিজ প্রকাশনা

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, মে ২০২৫
কপিরাইট © লেখক
প্রচ্ছদ : আজহার ফরহাদ
বর্ণবিন্যাস ও কম্পিউটার গ্রাফিক্স : ক্রিয়েটিভ ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স, ৪১ তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
অনলাইন ডিস্ট্রিবিউটর : রকমারি ডট কম, বাতিঘর ডট কম
ভারতে পরিবেশক : ধ্যানবিন্দু, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা
যুক্তরাজ্য পরিবেশক : সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক : মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

মূল্য : ২৬০ টাকা

Prohori by Saokot Hossain
First published in paperback in Bangladesh by BengalBooks in 2025
Text Copyright reserved by the Writer
Illustrations Copyright reserved by the Publisher

Printed and bound in Bangladesh

এক

পাঁজরের ওপর প্রচণ্ড লাথি খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল, তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো ও। এক পা পিছিয়ে গেল লোকটা, হাতে উদ্যত পিস্তল।

'নেমে পড়ো!' বললো সে।

'এখন? মাথা খারাপ? মারা পড়বো তো!'

'নইলে গুলি খাবে।'

পিস্তলের কালো নলের দিকে এক নজর তাকালো টমাস। 'ওসবে ভয় পাই না। চাইলে এখনই কেড়ে নিতে পারি ওটা, তবু নেমে যাচ্ছি।'

ঘুরে এগিয়ে গিয়ে ওয়্যাগনের রেলিং ধরে বাইরে ঝুলে পড়লো ও। গতি অনুমান করার চেষ্টা করলো এক মুহূর্ত, তারপর হাত ছেড়ে দিলো। ঝপাৎ করে মাটিতে পড়েই ডিগবাজি খেয়ে সিধে হয়ে দাঁড়ালো। ধুলোর মেঘ ভেদ করে একটা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

'...আর এই ধরো তোমার নোংরা ঝোলা!'

কয়েকশো গজ সামনে উড়ে এসে পড়লো একটা বান্ডিল। আস্তে আস্তে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল ট্রেনটা। কাপড় থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বিড়বিড় করে উঠলো টমাস রলিংস। 'আচ্ছা! দেখা যাবে...!' আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে চারদিকে চোখ বোলালো।

রেললাইনের পাশের উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ও, শূন্য প্রান্তরের বুকে এঁকেবেঁকে সামনে চলে গেছে লাইনটা। বাতাসে দুলছে লম্বা লম্বা ঘাস, আর কিছু নেই কোথাও।

ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পাগল হওয়ার দশা হয়েছে ওর। ট্রেন থেকে পতনের ফলে পুরোনো ক্ষতের সঙ্গে যোগ হয়েছে আরো কিছু, জায়গায় জায়গায় ছড়ে গেছে দেহের চামড়া।

আবার চারদিকে তাকালো ও। আর যা হোক, এখানে অন্তত ওকে খুঁজে পাবে না কেউ। ধীর পায়ে হাঁটতে শুরু করলো টমাস।

হঠাৎ মনে পড়লো ট্রেন থেকে ছুড়ে দেওয়া বান্ডিলটার কথা। পরনের কাপড় ছাড়া আর কিছুই তো সঙ্গে আনেনি ও; সবই ফেলে এসেছে। ওটা এলো কোত্থেকে?

প্রাণ বাঁচাতে পালাচ্ছিলো সে। চলন্ত ট্রেনে উঠে পড়ার আগে কারো সঙ্গে দেখা করতে পারেনি। শত্রুদের চেহারা না দেখলেও পেছনে স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে ওদের পায়ের আওয়াজ। নিরস্ত্র অবস্থায় ট্রেনটা ছিলো বাঁচার একমাত্র অবলম্বন। দৌড়ের ওপরই উঠে পড়েছিলো দ্রুতগতির ট্রেনটায়, তারপর ক্লান্তি আর অবসাদে ঢলে পড়েছে ঘুমের কোলে।

এক আধবার ঘুম ভাঙলেও জেগে থাকতে পারেনি, ক্লান্তিতে আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে চোখের পাতা। কমপক্ষে দুটো দিন কেটে গেছে ট্রেনেই। এখন তাহলে কোথায় আছে ও?

হাঁটতে হাঁটতে বান্ডিলটার কাছে এসে দাঁড়ালো রলিংস। খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো ওটার দিকে, ঝোপের ভেতর পড়ে রয়েছে একটা ক্যানভাস হ্যাভারস্যাক, একটা কম্বল।

উবু হয়ে বান্ডিলটা তুলে নিলো ও। বেশ ভারী। একবার ভাবলো, কার না কার জিনিস, থাকুকগে পড়ে—কিন্তু কম্বলের কথা ভেবে মত পালটাতে হলো। হিসাবে ভুল না হলে, সবচেয়ে কাছের শহরটা দশ-বারো মাইলের কম দূরে হবে না। রাত নামলে গায়ে দেওয়ার মতো একটা জিনিস তো পাওয়া গেল!

ট্রেনের অচেনা লোকটা 'নোংরা' বললেও জিনিসটা অত খারাপ নয়, বেশ ভালোই দেখাচ্ছে। হাঁটু মুড়ে বসে হ্যাভারস্যাকের মুখ খুললো ও। প্রথমেই বেরোলো চিজ ক্লথে প্যাঁচানো বড়সড় এক টুকরো বেকন, আর এক প্যাকেট কফি; এক বান্ডিল চিঠি, কয়েকটা চিরকুট এবং ম্যাপসহ একটা নোটবইও বেরোলো ব্যাগ থেকে। সযত্নে ভাঁজ করে রাখা মোটা কাপড়ের একটা স্যুট, আর পরিষ্কার দুটো শার্ট; একটা শার্ট কলার, কাফ লিংক, কলার বাটন এবং ক্ষুর, সাবান ইত্যাকার পুরুষালী জিনিসপত্রও রয়েছে ব্যাগের ভেতর।

আরো আছে একটা পয়েন্ট ফোর ফোর পিস্তল, আর একবাক্স গুলি। পিস্তলটা চেক করল রলিংস, লোডেড।

মুখ আটকে ব্যাগ আর কম্বল কাঁধে ফেলে আবার

এগোলো টমাস রলিংস।

ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে সবে। রেললাইনের পাশ দিয়ে এগিয়ে চললো ও, চলার গতি ঘণ্টায় মোটামুটি আড়াই মাইল।

হঠাৎ হঠাৎ হয়তো চোখে পড়ে যাচ্ছে খরগোশ, সাপ কিংবা শকুন। গাছপালা বা অন্য কোনো বুনো জানোয়ার, এমনকি বড়সড় কোনো পাথরের চিহ্নও নেই কোথাও। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো, বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা, প্রায় বিশ মাইল পথ পেছনে ফেলে এলো ও। এবার হঠাৎ করে চারপাশের দৃশ্যাবলিতে পরিবর্তন চোখে পড়লো। দু'বার অস্থায়ী সেতুর ওপর দিয়ে গিরি-সংকট পার হলো ও। অবশেষে এসে পৌঁছুলো একটা অগভীর ক্রিকের কাছে, ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে ওটা। তীর ধরে এগোলো টমাস। ছোট একটা বেসিনে এসে খুলেছে ক্রিকের মুখ, কটনউড আর উইলো বিক্ষিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে এখানে।

গাছপালার নিচে ঘাসে ছাওয়া সমান জায়গায় পাথরে তৈরি একটা চুলো দেখে ওটার দিকেই এগিয়ে গেল রলিংস। টুকরো টুকরো কাঠ আর কয়লা পড়ে আছে চারপাশে। শুকনো কাঠ জড়ো করে আগুন জ্বাললো ও। একটুকরো বেকন ঝলসে নিলো আগুনে। খেতে খেতে চোখ বোলালো চারদিকে। চমৎকার জায়গা, হাতের কাছে খাবার আছে, পানি আছে, বিশ্রাম নেওয়া যাবে নিশ্চিন্তে। কোথায় আছে জানা নেই ওর। শুধু বুঝতে পারছে, নিউ ইয়র্কের পশ্চিমে কোথাও এসে পড়েছে ও।

এগারো বছর বয়সে আয়ারল্যান্ড ছেড়ে আসার পর এ দেশের মানচিত্র চোখে দেখেনি কোনোদিন। চেনে কেবল ঐ নিউ ইয়র্ক শহরটাকেই।

এখানে ওকে ধরতে না পারলেও, ঠিকই খুঁজে বেড়াবে ওরা। বেশ তো—খুঁজুক!

নিরীহ গোবেচারা লোক নয় টমাস রলিংস। শৈশব থেকেই হাতাহাতি আর মারামারিতে হাত পাকিয়েছে। মাত্র ছ'বছর বয়সেই নামতে হয়েছে কাজে—বাবার কামারশালায় ঘোড়ার খুরের নাল বানানো, গাড়ি মেরামত করা—এসব শিখতে হয়েছে।

সেনাবাহিনীর ফেরিয়ারের কাজ নিয়ে একদিন ব্রিটিশ ভারতে চলে গেল বাবা, তারপর আর কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না তার। শেষে পেটের দায়ে একদিন মার হাত ধরে আমেরিকার পথে পাড়ি জমাতে হলো। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সাগরের বুকেই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে বিদায় নিলো মা। নিঃসঙ্গ, একাকী নিউ ইয়র্কে পৌঁছুলো ও, বন্ধু নেই, অর্থ নেই, নিঃস্ব।

জাহাজ থেকে মাটিতে নামতেই পড়লো ঝামেলায়। ওরই সমবয়সি একদল ছেলে দাঁড়িয়ে ছিলো। ওকে দেখে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়ে উঠলো তাদের একজন। জবাব দেওয়ার একটা উপায়ই জানা আছে টমাসের। মুঠি পাকিয়ে ছুটে গেল ও। প্রথম ঘুসিতেই চিৎপটাং হলো ছেলেটা, পরের ঘুসিতে আরেকজন। তারপর ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো সবকয়টা ছেলে।

প্রায় সাত-আটজন ছেলের বিরুদ্ধে ও একা। একাই মার ঠেকিয়ে পালটা মার দেওয়ার চেষ্টা করছে ও। এমনি সময় ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো একটা ছেলে। এ ছেলেটাও ছিলো জাহাজে।

মার খেতে খেতে কাহিল হয়ে গেল ওরা। হঠাৎ বাজখাঁই গলায় ধমকে উঠলো কে যেন—'থামো! ছেড়ে দাও ওদের!'

ওদের ছেড়ে দিয়ে চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল বজ্জাতগুলো।

প্রায় ছ'ফুট লম্বা, সুঠাম দেহের অধিকারী লোকটা, চওড়া একজোড়া গোঁফ শোভা পাচ্ছে ঠোঁটের ওপর; দেখেই বোঝা যায়, নাকটা ভাঙা।

ঠোঁট থেকে সিগার নামিয়ে লোকটা জানতে চাইলো, 'নাম কী তোমার?'

'রলিংস, স্যার। টমাস রলিংস।'

'মারামারি তো ভালোই জানো দেখছি,' বলেই চট করে অন্য ছেলেটার দিকে তাকালো আগন্তুক। 'আর তুমি?'

'পেনডেলটন, উইলিয়াম পেনডেলটন।'

'আচ্ছা। তোমার বন্ধু নাকি ও?'

'ঠিক তা নয়, স্যার। একই জাহাজে এলেও পরিচয় নেই। একা একা পারছিলো না ও, ভাবলাম একটু সাহায্য করি। এরকম অসম লড়াই আমার ভালো লাগে না।'

'আমারও না...আমার পক্ষে হলে অবশ্য আলাদা কথা। তোমরা দু'জনই শরীরে বেশ শক্তি রাখো দেখছি, তবু এদিকে

থেকো না, যত তাড়াতাড়ি পারো অন্য কোথাও চলে যাও।'

হাতের পিঠে কপালের ক্ষত থেকে বেরোনো রক্ত মুছলো রলিংস। 'যাওয়ার মতো কোনো জায়গা নেই আমার, মা মারা গেছেন জাহাজে—এখন একেবারেই একা আমি। আমাকে একটা কাজের ব্যবস্থা করে দেবেন?'

ঠোঁট থেকে সিগার নামালো আগন্তুক। কী যেন ভাবলো। তারপর পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করে কিছু লিখে দিলো তাতে। 'এই নাও, এ ঠিকানায় গিয়ে জ্যাকসনের খোঁজ করবে। এটা তাকে দিয়ে বলবে, ফ্রিম্যান পাঠিয়েছে।'

'ও যাবে?'

জবাব দিতে মুখ খুললো ফ্রিম্যান, কিন্তু তার আগেই বাধা দিলো পেনডেলটন। 'না, না, আমার জন্য ভাবতে হবে না। আমি আমার ঠিকানায় চলে যাচ্ছি, পথ চেয়ে বসে আছে বোধ হয় সবাই।'

বিদায় নিলো ফ্রিম্যান। পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করলো দুই কিশোর। বলিষ্ঠ গড়নের শরীর টমাস রলিংসের, মাথাভর্তি কালো চুল, চোখের রঙ নীল; নাকের ডগায় কয়েকটা তিল। পেনডেলটনের গড়ন ছিপছিপে, হালকা বাদামি রঙের চুল, রলিংসের তুলনায় বেশ লম্বা।

'ধন্যবাদ,' বললো রলিংস। 'আমাকে বাঁচিয়েছো তুমি।'

'আসলে মিস্টার ফ্রিম্যানই বাঁচিয়েছেন আমাদের। খেয়াল করলে, ওকে কেমন ভয় পায় সবাই?'

'যেমন শরীর, পাবেই তো!'

'উঁহু, আরো কোনো ব্যাপার আছে। মনে হয়, উনিই প্রাইজ ফাইটার, জুয়াড়ি জ্যাকব ফ্রিম্যান।'

'নামও শুনিনি।'

'বাবার কাছে ওনার অনেক গল্প শুনেছি আমি। খালি হাতে হেভিওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়ন উনি...মানে ছিলেন।'

পরস্পর করমর্দন করে যার যার পথ ধরলো দুই কিশোর।

ফ্রিম্যানের দেওয়া ঠিকানাটা একটা রেস্তোরাঁ কাম স্যালুন। দশ-বারোজন লোক আড্ডা মারছিলো। এদেরই একজনকে জ্যাকসনের কথা জিজ্ঞেস করলো রলিংস।

'ওদিকে দরজার পাশে। কিন্তু বাবা, সাবধান। খুব গরম হয়ে আছে ওর মাথা।'

সোজা জ্যাকসনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ও। 'আমার নাম টমাস রলিংস। একটা চাকরির জন্যে এসেছি।'

'চাকরির জন্যে এসেছ!' ধমকে উঠলো জ্যাকসন। 'ভাগো এখান থেকে! আমার কাছে কোনো চাকরি-বাকরি নেই!'

'মিস্টার ফ্রিম্যান এ কাগজটা আপনাকে দিতে বলেছেন,' জ্যাকসনের হাতে কাগজটা দিলো রলিংস। চিরকুটে চোখ বোলালো জ্যাকসন। লম্বা ছিপছিপে এক লোক দাঁড়িয়ে ছিলো তার পাশে, ঝুঁকে পড়ে চিরকুটের দিকে তাকালো সেও।

'তাকে চেনো তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'এ ছেলের সঙ্গে মেজাজ দেখাতে যেও না, জ্যাক। ওল্ড স্মোক নিজে লিখে দিয়েছে...ওর হাতের লেখা তো নকল করা

সম্ভব না! উঁহু উপায় নেই তোমার।'

'ঠিক আছে,' বিরক্তির সঙ্গে বললো জ্যাকসন, 'যাও, কী কাজ করবে, করো গে!'

চট করে উঠে অন্যদিকে চলে গেল সে।

হাসলো লম্বা লোকটা, 'কিছু ভেবো না তুমি। সব ঠিক আছে। আসলে কারো ফরমায়েশ শুনতে একটুও পছন্দ করে না জ্যাকসন, অন্তত ওল্ড স্মোকের তো নয়ই। তবু তার কথা রাখবে ও। ধরে নাও, চাকরি একটা মিলেই গেছে।' কী মনে করে লোকটা আবার বললো, 'আমি ওর পার্টনার, হেনরি চাইল্ড। যাও, রান্নাঘরে বাসন-কোসন ধোয়ার কাজে লেগে পড়ো—আর যাই হোক, কাজের কোনো অভাব হবে না। আর হ্যাঁ, জ্যাকসনকে নিয়ে ভেবো না, কথাবার্তায় যা মনে হয়, অত খারাপ নয় লোকটা।'

এভাবেই জুটে গেল কাজটা। জ্যাকসনের স্যালুনে নানারকম খুঁটিনাটি কাজ করে চললো ও—ঘর ঝাঁট দেওয়া, তরকারি কোটা, বাসন-কোসন ধোয়া ইত্যাদি।

সপ্তাহখানেক পর আবার দেখা হলো হেনরি চাইল্ডের সঙ্গে। 'আগে কোথাও কাজ করতে তুমি?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'হ্যাঁ, আমার বাবা ছিলেন একজন ফেরিয়ার। অনেক নামিদামি লোকের ঘোড়ার খুরে নাল পরিয়েছি আমরা... ঘোড়দৌড়েও যোগ দিয়েছি।'

তীক্ষ্ণ হলো হেনরি চাইল্ডের দৃষ্টি। 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, নয় বছর বয়সেই প্রথম ঘোড়া হাঁকিয়েছিলাম। তারপর

আরো এগারোবার রেস খেলেছি।'

'ঘোড়াগুলো নিশ্চয় আইরিশই ছিলো?'

'হ্যাঁ, দুর্দান্ত সব ঘোড়া!'

'জিততে পেরেছো এক-আধবার?'

'হ্যাঁ, তিনবার।'

মাথা ঝাঁকালো হেনরি। 'এক কাজ করো, সময় করে একবার ম্যাককোলিন্‌সের ওখানে যেও, কেমন? ওর একটা কামারশালা আছে, তার হয়তো লোকের দরকার হতে পারে।'

ভদ্র স্বভাবের লোক ম্যাককোলিন্‌স, কামার হিসেবে অসাধারণ। কামার হিসেবে ওর বাবাও কম ছিলো না, নইলে কি আর রেসের ঘোড়ার নাল পরানোর কাজ পায়! কিন্তু এ লোককে বলতে হবে সেরা।

'বাঁচতে হলে, টিকে থাকতে চাইলে, সেরা হওয়া ছাড়া উপায় নেই,' একদিন বললো ম্যাককোলিন্‌স। 'হাজার হাজার কামার আছে নিউ ইয়র্কে, এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে সেরা কাজটাই দেখাতে হবে তোমাকে। তবে দেখো, এমন একদিন আসবে—ঘোড়া, আস্তাবল এসবের নিশানাও থাকবে না আর এ শহরে।'

'তাহলে সবাই চলবে কীভাবে?'

'অন্য কিছু আসবে হয়তো; অন্য কোনো রকম গাড়ি।'

'তোমার কী হবে তখন?'

'আর সবার যা হবে, আমারও তাই হবে।' তীক্ষ্ণ চোখে হঠাৎ রলিংসের দিকে তাকালো ম্যাক। 'তোমার বাবা ফেরিয়ার

ছিলো, বলেছিলে না? কী হয়েছে তার?'

'সেনাবাহিনীর সঙ্গে ভারতে গিয়েছিলেন বাবা, তারপর আর কোনো খোঁজখবর পাইনি। ধরে নিয়েছি, বাবা আর বেঁচে নেই।'

'হ্যাঁ, যুদ্ধের নিয়মই এমন—এই অগুনতি লোক যাবে, ফিরে আসবে মাত্র গোনা কজন। বাকিদের ভাগ্যে কী ঘটে জানা যায় না কোনোদিন।' রলিংসের দিকে চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকালো ম্যাক। 'শেষ পর্যন্ত কী করতে চাও তুমি? স্যালুনের নগণ্য একজন ওয়েটার? উঁহু, একদম বিশ্রী ব্যাপার। তার চেয়ে বরং এক কাজ করো, পশ্চিমে চলে যাও, ওখানে গিয়ে তোমার বাবার ব্যবসা ধরো।'

'পশ্চিম? সে আবার কেমন জায়গা?'

'এখান থেকে অনেক দূরে, এক বিশাল দেশ! সোনা আর রুপোর ছড়াছড়ি নাকি ওখানে, মাইলকে মাইল জমি—খালি পড়ে আছে।'

'আর আছে বর্বরতা।'

'হ্যাঁ, তা হয়তো আছে। কিন্তু বর্বরতা এ শহরেও কি কম?' একটু থামলো সে। 'এ জায়গাটা কি খুব ভালো? বেশিরভাগ মেয়ের কোনো পরিচয় নেই, লোকগুলো চোর আর বদমাশ। এরকম জায়গায় তোমার মতো ছেলেদের কিছুতেই থাকা উচিত নয়।'

'আর কোনো জায়গা নেই আমার। এখানে মিস্টার ফ্রিম্যান আমার সঙ্গে আছেন।'

'অ...চিনি ওকে, মারামারি আর কূটবুদ্ধি দিয়েই এ পর্যন্ত এসেছে সে, বড় বড় লোকদের সঙ্গে মিশছে। পেছনে নাক সিঁটকালেও, সামনে ভয়ে কুঁকড়ে থাকে সবাই। নির্বাচনের সময় দেখবে,' গম্ভীর কণ্ঠে বললো ম্যাককোলিন্‌স, 'মরা মানুষ পর্যন্ত ভোট দিতে চলে আসছে। নিজের চোখেই তো দেখা।'

হাসতে হাসতে মাথা ঝাঁকালো রলিংস। 'আসলে খুব চালাক লোক উনি।'

থুতু ফেললো ম্যাককোলিন্‌স। 'হয়তো। কিন্তু অসৎ একজন লোকের পরিণতি কখনোই শুভ হতে পারে না। অথচ সৎপথে চললে পরিণতির জন্য ভাবতে হয় না কখনো।

'লোক-ঠকানো যাদের অভ্যাস, সবাইকেই ঠকায় তারা। এরকম লোকদের বিশ্বাস করাই ঠিক না...আর মেয়ে হলে তো কথাই নেই—সাপের মতো এড়িয়ে চলা উচিত।'

কাঁধ ঝাঁকালো রলিংস। ম্যাককোলিন্‌স কে, এত কথা বলার? একটা কামারশালার মালিক মাত্র, কয়জন লোককে চেনে সে? আর ফ্রিম্যানের স্যালুন-রেস্তোরাঁ ছাড়াও আরও কত কী যে আছে! কে জানে, কত লোকের সঙ্গে তার জানাশোনা; সবাই কত সম্মান করে তাকে!

কোনো কিছু না জেনে মা-ও এরকম বড় বড় কথা বলত।

ক্যাম্প তৈরি করতে করতে এসব কথা ভাবছিলো টমাস রলিংস। কম্বলের বান্ডিলটা গাছের গভীর ছায়ায় নিয়ে এলো ও। আগুনের কাছে শোয়ার ইচ্ছে থাকলেও সাহসে কুলালো না। নিউ ইয়র্কে ইন্ডিয়ানদের অনেক গল্প শুনেছে ও। জানে,

শিকারে ওদের জুড়ি মেলা ভার। রাতদুপুরে তাদের মুখোমুখি হওয়ার ঝুঁকি নিতে চাইলো না তাই।

কম্বলের ভাঁজ খুলতেই বেরিয়ে পড়লো একটা শটগান, জোড়া খুলে দু'ভাগ করে রাখা, জুড়ে দিলেই হয়ে গেল। শটগানের টুকরো দুটো রাখার টিউব কনটেইনারও রয়েছে—গুলিতে ভরা।

শটগানটা জোড়া লাগিয়ে গুলি ভরে তৈরি করে রাখলো রলিংস। তারপর মাথার নিচে হাত রেখে চিত হয়ে শুয়ে পড়লো। বাতাসে কাঁপছে গাছের পাতা, মৃদু ঝিরঝির শব্দ উঠছে, কান পেতে শুনতে লাগলো ও। ধীরে ধীরে নিভে আসছে আগুনটা। বহুদিন পর আবার আয়ারল্যান্ডের কথা মনে পড়ছে আজ।

কত সুখের ছিলো সেইসব দিন। বাবা নিখোঁজ হওয়ার পর প্রায়ই উপোস থাকতে হতো, তবুও ছোট্ট সবুজ দেশটায় জীবন ছিলো আনন্দের।

প্রায় বারোটা বছর নিউ ইয়র্কে কাটিয়েছে ও...প্রথম থেকেই কঠিন ছিলো এখানকার জীবন। প্রায় প্রতিদিনই মারামারি করতে হয়েছে যত্রতত্র। কিন্তু কামারশালার কাজ লোহার মতো শক্ত করে দিয়েছে ওর হাত, অনায়াসে হারিয়ে দিয়েছে সবাইকে।

পারতো না কেবল একজনের সঙ্গেই—টেরন কপ। ওর দু'চার বছরের বড়ই হবে ছেলেটা, স্বাস্থ্যও তেমনি। এরই কাছে চার-চারবার চরম পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে ওকে। তবে মার খেতে খেতে শিখেছেও প্রচুর।

বাঁ হাতে ঘুসি মেরে হাতটা নামিয়ে ফেলার বদ-অভ্যাস

ছিলো টেরনের। একদিন মারামারি করতে গিয়ে এই সুযোগটাই কাজে লাগালো টমাস। টেরনের বাঁ হাতের ঘুসি হজম করে সাথে সাথেই একটা ডান হাতের প্রচণ্ড ঘুসি তার বাঁ চোয়ালে ঝেড়ে দিলো ও। দড়াম করে পড়লো সে, উঠে দাঁড়ালো সাথে সাথে। একটা ফল্‌স স্টেপ দিলো রলিংস। ফাঁদে পা দিলো টেরন কপ, আবারো বাঁ হাতের ঘুসি হানলো সে। বাউলি কেটে সরে গেল টমাস, একই ভঙ্গিতে বাঁ চোয়ালেই আবার ঘুসি হাঁকালো। এবং সেইসঙ্গে সমাপ্তি ঘটলো টেরন কপ পর্বের।

এভাবেই একসময় ফ্রিম্যানের সংবাদ বাহকের দায়িত্ব চাপলো ওর কাঁধে। ফ্রিম্যানের বিভিন্ন জুয়ার আড্ডা আর অন্যান্য আস্তানায় আদান-প্রদান করতে লাগলো ও।

তবে সপ্তাহয় দু-তিনদিন ম্যাককোলিন্‌স-এর কামারশালার কাজটাও চালিয়ে গেল সমান তালে। প্রচণ্ড পরিশ্রমের কাজ হওয়া সত্ত্বেও সে যেন অনাবিল আনন্দের খোরাক পেতো ওই কাজে। ম্যাককোলিন্‌সকেও খুব ভালো লেগে গিয়েছিলো ওর—বুড়ো আইরিশ লোকটাকে পাপ কখনো স্পর্শ করতে পারেনি।

ম্যাককোলিন্‌সের ওখানে কাজ না থাকলে, ওর গন্তব্য হতো স্যালুন কিংবা কোনো রেস্তোরাঁ।

কাজ করতে করতে একদিন পুরোনো এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল টমাসের। ওর বয়স তখন পনেরো। ফাইভ পয়েন্টসের ওদিক দিয়ে নিশ্চিন্তে আসছে। হঠাৎ চোখ পড়লো ‘মেইড অব কিলারনি’র ওপর...। একটা কসাইয়ের ওয়্যাগনের

সঙ্গে বাঁধা। ওয়্যাগনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো ও, চোরাচোখে ভালো করে পরখ করলো ঘোড়াটাকে—খুরের মাথায় সেই পুরোনো চিহ্ন—নাহ্, কোনো সন্দেহ নেই, এটাই সেই ঘোড়া।

মাংস ডেলিভারি দিতে গেছে কসাই, রেখে গেছে ঘোড়াটা। হঠাৎ সামনে এগিয়ে এসে টমাসের দিকে গলা বাড়িয়ে দিলো ওটা। 'চিনে ফেলেছিস, না?' ঘোড়ার গায়ে মৃদু চাপড় দিলো রলিংস। এমন সময় সামনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো ড্রাইভার। 'চমৎকার ঘোড়া,' ড্রাইভারের উদ্দেশে মন্তব্য করলো ও।

'অস্থির,' ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দিলো ড্রাইভার। 'অসম্ভব অস্থির!'

ওয়্যাগনের গায়ে লেখাটা এক নজর দেখলো টমাস। তারপর হাঁটতে শুরু করলো। ড্রাইভার দৃষ্টির আড়াল হতেই ঝেড়ে দৌড় দিলো ও। জানে, আট নম্বর বার্কলে স্ট্রিটের জুয়ার আড্ডায় একটা মিটিং আছে ফ্রিম্যানের—ওখানেই পাওয়া যাবে তাকে।

জুয়ার আড্ডায় ঢুকে পড়লো টমাস রলিংস। আরো কয়জন লোকের সঙ্গে আলাপে মগ্ন জ্যাকব ফ্রিম্যান, এক হাতে বিয়ারের গ্লাস, অন্য হাতে সিগার। একটু ইতস্তত করলো ও, তারপর সোজা ফ্রিম্যানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

'স্যার!'

কাজে বাধা দেওয়া মোটেই পছন্দ করে না ফ্রিম্যান। চোখে

বিরক্তি নিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো সে। কিন্তু রলিংসকে দেখেই মুছে গেল বিরক্তির ছাপ।

'কী ব্যাপার? কোনো গোলমাল?'

'স্যার, এখনই একটা কথা শুনতে হবে আপনাকে।'

বিস্ময়ের একটা ভাব ফুটে উঠলো ফ্রিম্যানের চোখে। গত দেড় বছরে নিজ থেকে কখনো কথা বলেনি এ ছেলে; চুপচাপ কাজ করে যাওয়াই যার স্বভাব, সে-ই কি না নিজ থেকে কথা বলতে চাইছে! তার মানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু!

'কী কথা?'

'আর কারো সামনে বলা যাবে না।'

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো ফ্রিম্যান। 'একটু আসছি,' সঙ্গীদের উদ্দেশে বললো সে।

টমাসকে নিয়ে কোণের একটা টেবিলে এসে বসলো। 'হ্যাঁ, এবার বলো, কী কথা। দেখতেই পাচ্ছো, খুব ব্যস্ত রয়েছি।'

'স্যার, এইমাত্র "মেইড অব কিলারনি"কে দেখে এলাম।'

'কাকে? "মেইড অব কিলারনি" আবার কী?'

'একটা ঘোড়া, স্যার। রেসের ঘোড়া। ফাইভ পয়েন্টসে একটা কসাইয়ের ওয়্যাগন টানছে।'

ঠোঁটে সিগার ঝোলালো ফ্রিম্যান। 'কসাইয়ের ওয়্যাগন টানছে রেসের ঘোড়া? তার মানে, ওটার অবস্থা নিশ্চয় কাহিল হয়ে গেছে?'

'বোধ হয় না, স্যার। ঠিকই আছে...একটু কেবল যত্ন-আত্তির দরকার। ঘোড়াটাকে আমি চিনি, দুর্দান্ত জোরে ছুটতে

পারে, দৌড় লাগালে এখনো যেকোনো ঘোড়াকে হারিয়ে দিতে পারবে!'

'ঠিক আছে, ওটার কথা শোনাও দেখি...।'

কদ্দিন আগের কথা এসব? মাথার নিচে হাত রেখে গাছের পাতার নাচন দেখছে টমাস রলিংস। দশ বছর? কত, কতদিন আগের কথা!

আস্তে আস্তে ঘোড়াটার কথা ফ্রিম্যানকে খুলে বললো টমাস। ঘোড়াটার জন্মের সময় ওর উপস্থিতির কথা, ওটার পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ানোর কথা, তারপর ওটাকে নিয়ে প্রথম রেসে যোগ দেওয়ার কথা—সব।

'প্রথমবারেই জিতলো ঘোড়াটা,' বললো ও, 'তারপরের বারও। এরপর অন্য একজন লোক চালিয়েও জিতলো পরপর দু'বার। কিন্তু জুয়ায় হেরে গিয়ে ঘোড়াটা খোয়ালো মালিক। পরে এক আমেরিকান কিনে নিলো ওটা।'

সিগারের ছাই ঝাড়লো ফ্রিম্যান। 'ঠিক জানো, এটাই সেই ঘোড়া?'

'হ্যাঁ। আমার বাবাই প্রথম নাল পরিয়েছিল ওটার খুরে। কত ঘুরেছি আমি ঐ ঘোড়ার পিঠে চড়ে। আমার ভুল হয়নি। তাছাড়া, ঘোড়াটা আমাকে চিনতে পেরেছে।'

'এখন কত বয়স হবে ওটার?'

'পাঁচ...একটু বেশিও হতে পারে।'

দুদিন পর আবার ওকে ডেকে পাঠালো ফ্রিম্যান। 'কসাইয়ের ওয়্যাগন চালাবে, টম?'

‘আপনি বললে...’

‘ঠিক আছে, আজই লেগে যাও। ওয়্যাগন চালাবে আর খেয়াল রাখবে ঘোড়াটার দিকে। দুপুর নাগাদই বোধ হয় ডেলিভারি শেষ হয়ে যায়। কাজ শেষে সোজা চলে যাবে ফেনওয়েের ওদিকে। কাল তো শনিবার, এক কাজ করো, পরশু সকালে ট্র্যাকে নিয়ে গিয়ে একটু হাঁটাচলা করিয়ে দেখো ঘোড়াটাকে, কেমন?

‘হেনরি চাইল্ডও থাকবে ওখানে, ও তো খুব দক্ষ হর্সম্যান। এতদিন অযত্ন, অবহেলায় আছে ঘোড়াটা, প্রথমেই বেশি জোরে ছোটাতে যেও না যেন।

‘আর হ্যাঁ, এসব কথা আর কারো কানে যেন না যায়; মনে থাকবে তো?’

রোববার সকাল, একটু একটু কুয়াশা পড়ছে, হাওয়া বেশ ঠান্ডা। ‘মেইড অব কিলারনি’কে নিয়ে ট্র্যাকে এলো ও। ওকে ঘোড়ার পিঠে তুলে দিলো হেনরি চাইল্ড।

‘মাত্র এক চক্কর। কেমন চলছে, দেখো শুধু।’

ট্র্যাকে দাঁড়াতেই নাড়া পড়লো ঘোড়ার স্মৃতিকোষে। মাথা উঁচিয়ে ছুটতে চাইলো ওটা। ‘উঁহু, দাঁড়া...আস্তে-আস্তে!’

স্বচ্ছন্দে এক চক্কর ঘুরে এলো ঘোড়াটা। ওর ফিরে আসার অপেক্ষা করছিলো হেনরি। ‘ভালোই,’ বললো সে, ‘একটু আড়ষ্ট হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।’

আবার ঘোড়া হাঁকালো টমাস। এবার কিছুটা দ্রুত গতিতে।

ছোটার জন্যে ক্ষেপে আছে যেন ঘোড়াটা, অনেক কষ্টে সামলে রাখলো ও।

পরের এক সপ্তাহ দেখতে মোটামুটি একইরকম ঘোড়া দিয়ে ওয়্যাগন চালালো রলিংস। বিকেলের দিকে 'মেইড অব কিলারনি'কে ট্র্যাকে নিয়ে গিয়ে অনুশীলন করলো। ঘোড়াটা নিয়ে ফ্রিম্যান কী করতে চাইছে জানা ছিলো না ওর।

'টম,' একদিন বললো ফ্রিম্যান। 'ঘোড়া নিয়ে বার্কলে স্ট্রিটে এসো না যেন। ওখানে প্রায়ই এক লোক জুয়া খেলতে আসে, নিজেকে খুব চালাক ভাবে সে। একটা ঘোড়া আছে তার, সেটা নিয়ে কয়দিন ধরে খুব বড়াই করছে লোকটা; আমার এক বন্ধু অবশ্য ওকে জব্দ করার তালে আছে।'

সপ্তাহখানেক পর, আবার মেইডকে দিয়ে ওয়্যাগন চালাচ্ছে রলিংস। সেদিনই ডেলিভারি দিতে বার্কলে স্ট্রিটে আসতে হলো ওকে। মাংসের প্যাকেট নিয়ে ওয়্যাগন থেকে নামতে যাবে, হঠাৎ দেখতে পেলো ফ্রিম্যানকে। আরো কয়েকজন লোক আছে তার সাথে। তাদেরই একজনের কণ্ঠ পরিষ্কার শুনতে পেলো টমাস। 'কী? আরে, আমার ওয়েড হ্যাম্পটন ঐ দুটোকেই হারাতে পারবে, বুঝলে!'

লোকটার কণ্ঠের ঝাঁঝে ঘাড় ফিরিয়ে তাকানোর ইচ্ছে করলেও তাকালো না রলিংস।

'বব,' কথা বললো অন্য একজন, 'ওয়েড হ্যাম্পটনকে নিয়ে কদিন ধরে বড়-বেশি বড়াই করছো তুমি। খালি কথাই শুনি, কাজ তো দেখি না! আমার মনে হয়, সবই তোমার চাপাবাজি!'

'কী! গত ছ'টা রেসে জিতেছে আমার হ্যাম্পটন—পরের ছ'টাতেও জিতবে। এতই যদি দেখার শখ, একটা ঘোড়ার ওপর বাজি ধরো না দেখি, শ্যাংক। বোঝা যেতো কত সাহস!'

'বাহ্।' শ্যাংকের কণ্ঠে উষ্মা, 'ভালো করেই জানো, আমার কোনো ঘোড়া নেই। আচ্ছা, ঠিক আছে, এই বললাম, ঐ কসাইয়ের ঘোড়াটার সঙ্গেই পারবে না তোমার সাধের ওয়েড হ্যাম্পটন!'

'কী!'

'বোকামি করো না, শ্যাংক!' প্রতিবাদ করলো আরেকজন, 'দৌড়ুতেই পারবে না ওটা!

'কিছু মনে করো না বব—এমনি ঠাট্টা করে কথাটা বলেছে শ্যাংক।'

'মোটেই না!' রাগত স্বরে বললো শ্যাংক। 'ঠিকই বলছি। ববের কথায় মনে হয়, ওরটা ছাড়া দুনিয়ায় যেন আর কোনো ঘোড়া-টোড়া নেই! যত্তোসব বাকোয়াজ!'

কাঁধ ঝাঁকালো হেনরি চাইল্ড। 'একটা রেসের ঘোড়াকে হারাবে ওটা? বলো কী! মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি! কিন্তু তুমি জিদ করলে এই আমিও বাজি রেখে বলছি—ওয়েড হ্যাম্পটনই জিতবে!'

'আমিও!'

ইতস্তত করলো শ্যাংক। 'আমি...মানে...ঠিক...'

'কেটে পড়ার মতলব, না?' ঝাঁঝিয়ে উঠলো বব কার। 'একটু আগে বললে, আমি নাকি চাপাবাজি করি। এখন?'

‘আমি মোটেই চাপাবাজি করি না, কক্ষনো না! বলেছি যখন—বাজি লাগবোই লাগবো। ঠিক আছে, আমার কাছে এক লক্ষ ডলার আছে...পুরোটাই বাজি...কসাইয়ের ঘোড়াই জিতবে!’

‘এক লাখ?’ এই প্রথম কথা বললো ফ্রিম্যান। ‘অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু, শ্যাংক!’

‘আমার আছে, ব্যস—বাজি ধরলাম,’ একগুঁয়ে কণ্ঠে বললো শ্যাংক। ‘রাজি থাকলে বলো, নইলে চেপে যাও!’

‘ভেবে-চিন্তে কাজ করো, শ্যাংক। ববেরটা রেসের ঘোড়া। আর ঐ ঘোড়াটা তো একেবারে বুড়ো—দৌড়ুতেই পারবে না। বাদ দাও এসব বাজি-টাজি।’

‘সেটি হচ্ছে না আর,’ বললো হেনরি। ‘বাজি ধরে ফেলেছে ও। তবে একটা শর্ত আছে আমার—কালকে হতে হবে খেলাটা।’

বব কারের দিকে ঘাড় ফেরালো হেনরি। ‘এরচেয়ে সহজ বাজি আর হয় না, বব। অ্যান্ডি শ্যাংক বোকা জানতাম, কিন্তু এতটা বেকুব ভাবতেও পারিনি। কত টাকা ধরছো বব? ইচ্ছে করলেই অনেক টাকা ধরা যায় কিন্তু!’

‘ভেবে দেখতে হবে।’ ভুরু কুঁচকে উঠলো ববের।

‘আমি...ধরো, চল্লিশ হাজার দিলাম। এখন তুমি হাজার ষাটেক দিতে পারলেই—ব্যস, কেল্লাফতে; সব টাকা চলে আসবে আমাদের হাতে।’

‘অনেক টাকার মামলা,’ বিড়বিড় করে বললো বব কার।

‘নিশ্চয়, কিন্তু ভেবে দেখো। এতগুলো টাকা সারা বছরেও

আয় করতে পারবে না তুমি, এক বছর কী বলছি, তিন বছরেও পারবে না। আর কেউ হাতিয়ে নেওয়ার আগেই এই গর্দভটার কাছ থেকে টাকাগুলো আমরা নিয়ে ফেলি না কেন।'

'ফ্রিম্যান কি আমাদের পক্ষে?'

কাঁধ ঝাঁকালো হেনরি। 'কী জানি, কিছু তো বলছে না। তবে নিশ্চিন্ত থাকো তুমি, জিতছি দেখলে ঠিকই ভিড়ে যাবে আমাদের দলে। অবশ্য জুয়ার আড্ডা চালালেও জ্যাকব নিজে সাধারণত বাজি ধরাধরিতে যায় না।'

এসবই দশ বছর আগের কথা! রেসের দিনটার কথা আজও মনে আছে টমাস রলিংসের।

আগেই ওকে সতর্ক করে দিয়েছিলো ফ্রিম্যান। 'না জিতলেও খুব বেশি তফাতে থেকো না, কেমন?'

'মেইড অব কিলারনি'ই জিতলো। ষাট হাজার টাকা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলো শ্যাংক, হেনরি আর ফ্রিম্যান।

ম্যাককোলিন্‌সকে রেসের কথা বললো রলিংস। কাজে ব্যস্ত ছিলো ম্যাক, সোজা হয়ে দাঁড়ালো সে। 'এসবের ভেতর তুমি ছিলে? লজ্জা হওয়া উচিত তোমাদের! স্রেফ প্রতারণা এটা!'

'কিন্তু হেনরি চাইল্ডও তো টাকা খোয়ালো!' প্রতিবাদ করলো রলিংস।

থুতু ফেললো ম্যাককোলিন্‌স। 'যা ভেবেছি, তুমি দেখছি তার চেয়েও সোজা ছেলে। এমন জ্বলজ্যান্ত মিথ্যা বিশ্বাস করে বসে আছো! টাকা দিতে দেখেছো হেনরিকে?'

'বাজির টাকা ফেল্টনের কাছে জমা ছিলো। সে বলেছে...'

'ও, ফেল্টন! ঐ একই গোয়ালের গরু। শোনো ছেলে, হেনরির কাজই হলো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অন্যকে বাজি ধরিয়ে উসকে দেওয়া। আর ফ্রিম্যান? পালের গোদা সে-ই। এমন ভান করে থাকে, ভাজা মাছটি যেন উলটে খেতে জানে না। আসলে অসম্ভব ধূর্ত লোক ওল্ডস্মোক। পারলে ওর কাছ থেকে দূরে থেকো, নইলে জেলে পচেই মরতে হবে শেষে!'

ঘোড়াটা জেতায় ওকে পাঁচশো ডলার বকশিস দিলো ফ্রিম্যান। একসঙ্গে এত টাকা ওর বাবাও দেখেনি কোনোদিন। দু'শো ডলারে কিছু জামাকাপড় কিনলো ও আর একটা থাকার জায়গার ব্যবস্থা করলো। ম্যাককোলিন্সের কথামতো একটা ব্যাংকে রেখে দিলো বাকি তিনশো।

এরপর আরো তিনবার ঘোড়াটাকে নিয়ে রেসে নেমেছে টমাস রলিংস। এরইমধ্যে ষোলো পেরিয়ে সতেরোয় পা দিয়েছে, লম্বায় দাঁড়িয়েছে পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি; ওজন প্রায় একশো ষাট পাউন্ড। মাঝে মাঝে ওল্ডস্মোকের সঙ্গে অনুশীলন করেছে, কিন্তু এই দুর্দান্ত আইরিশ মুষ্টিযোদ্ধার সঙ্গে পেরে ওঠেনি একবারও। ভীষণ-দর্শন সব গুন্ডা-পান্ডার মোকাবেলা করতে হয়েছে প্রায়ই।

অনেকগুলো মাস পেরিয়ে গেল। এরমধ্যে বব কার কিংবা তার লোকজনের কোনো খোঁজখবর মেলেনি।

একদিন ফাইভ পয়েন্টসের ওদিক দিয়ে আসছে, হঠাৎ একটা লোককে দেখে থমকে দাঁড়ালো ও। অবিকল বব কারের